বাংলা বই ও গ্রন্থাগার

চৈতালী দত্ত

বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রসার অর্থাৎ ইংরেজী ধারায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সূত্রপাত ও বিস্তার কিন্তু খুব বেশি দিনের কথা নয়। বাংলাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ওয়ারেন্ট হেস্টিংসের মাথায় খেলে গিয়েছিল এক নতুন চিন্তা যা আমাদের শিক্ষার পটভূমি ও পরিস্থিতিকে আমূল পরিবর্তিত করেছিল। হেস্টিংস ভেবেছিলেন সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থেই বৃটিশ সিভিলিয়ানদের চলনসই বাংলা অক্ষরের যে উদাহরণগুলি ছিল, সেগুলি ছাপবার উপযুক্ত বাংলা হরফ তখনো তৈরী হয়নি বলে যে অসুবিধের সৃষ্টি হল তার সমাধান করলেন হেস্টিংসের আর এক শুভানুধ্যায়ী চার্লস উইলকিনস। সংস্কৃত, বাংলা এবং অন্যান্য প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, বিদ্যানুরাগী উইলকিন্স তৈরী করলেন ধাতুনির্মিত, চলনশীল বাংলা হরফ। ১৭৭৮ -এ প্রকাশিত হল হ্যালহেডের ব্যাকরণ - মুদ্রণশিল্পের দাক্ষিণ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান নির্মিত হল।

বাংলা মুদ্রনের বা বাংলা চলনশীল হরফ সম্পর্কে কথা বলার একটিই উদ্দেশ্য তা হল বাংলা ভাষায় রচিত বইপত্রের প্রথম যুগের অবস্থানটির দিকে চোখ ফেরানো। আজ পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমে বা বাহন হিসেবে প্রথমেই বই - এর কথা মনে আসে। বর্তমান যুগ যদিও বই এর চেয়ে 'অ - বই' (স্ক্রু - স্প্লস্ন্স) পাঠ্যসামগ্রীর দিকে ঝুঁকছে বেশি--- তবুও বই এখনো পাঠসামগ্রীসমূহের মধ্যে জনপ্রিয়তম। এর প্রধান কারণ বই - এর বিশেষ কতগুলি বেশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত আছে। যেমন-- বই সবসময়ে, সব অবস্থায় বহন ও পাঠযোগ্য আর সেই কারণেই এর ব্যবহার সবচেয়ে সুবিধাজনক। বই পাঠ করতে অন্য কোন উপকরণ বা যন্ত্রপাতি কিছুই লাগে না। এছাড়া দামের ঊর্ধমুখীনতা সত্ত্বেও বই এখনো সাধারণ মানুষের ত্রয়ক্ষমতার মধ্যেই আছে। সুতরাং শিক্ষার এই অন্যতম মূল উপাদানটি ছাপা অবস্থায় বাংলাদেশে কবে, কিভাবে এল এবং জনচিত্ত জয় করল, কিভাবেই বা তার প্রয়োজনীয়তা সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকৃত হল সে সম্পর্কে একটি কৌতূহল তো থেকেই যায়।

আমাদের কলকাতা তখনো নাবালকত্বের স্তর পেরোয়নি। শহর গড়ে উঠছে --- ব্যবসা - বাণিজ্য বাড়ছে, ভিড় বাড়ছে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা ভাগ্যান্বেষীদেরও। অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রহরের ঘন্টাধবনি শোনা যাচ্ছে। ততদিনে শহরের বুকে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ইংরেজী বিদ্যালয়। আবার এইসব ইংরেজি স্কুলের পাশাপাশি টিঁকে ছিল সনাতনী টোল, পাঠশালার অস্তিত্বও। ঊনিশ শতকের একেবারে সূচনালগ্নে জন্ম নিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসেলির প্রচেষ্টায় এটি স্থাপিত হল। উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায় কিছুটা শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু পড়াবার উপযুক্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক তখন ছিল না। ওয়েলেসলির অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলেন। উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দিলেন। কেরীর উদ্যোগে ও উৎসাহে বাংলায় পাঠ্য পুস্তক রচনার কাজ এগিয়ে চলল জোর কদমে। শ্রীরামপুর মিশনে। শ্রীরামপুর তখন ডাচ শাসনাধীন। মিশনে যোগ দেবার আগেই নিজের বাংলাজ্ঞানের ভিতটিকে বেশ পাকাপোক্ত করেছিলেন কেরী। বাংলা বইমেলা অনুবাদের কাজটিও ততদিন শেষ করেছেন। শ্রীরামপুর মিশনে একটি ছাপাখানা স্থাপন করে বাইবেলের অনুবাদটি ছাপাবার কথাই তখন ভাবছেন কেরী। বন্ধু জর্জ উড্নি কেরীকে যে কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি উপহার দিয়েছিলেন,

সেটিই বসানো হল শ্রীরামপুর মিশনে। জন্ম নিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস।
কেরীর জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল ছাপাখানায় কাজ করার এবং সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাও। এবার শিক্ষকতার সূত্রে বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই - এর নিদাণ অভাব আবিষ্কার করে সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োজিত করলেন এই ক্ষেত্রে। তাঁর উৎসাহ ওঅনুরোধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপদের অনেকেই বাংলা গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্য ালঙ্কারের নাম আগেই উল্লেখকরা হয়েছে। এছাড়াও ছিলেন রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায়, চন্ডীচরণ মুনশী প্রমুখ। কেরীর নিরলস উদ্যোগে একের পর এক বাংলা গ্রন্থ রচিত ও মুদ্রিত হতে থাকল। এগুলির মধ্যে সব কয়টিই নিছক পাঠ্যবই নয় --- ভিন্নতর পাঠমূল্য আছে এমন বইও অনেক ছিল। এপ্রসঙ্গে দু'টি ঘটনা লক্ষণীয়। এক, কেরীসাহেবের বাংলায় পাঠ্যবই - এর অভাব জনিত সমস্যার আংশিক সমাধান; আর দ্বিতীয়টি হল,এইসব পাঠ্যবই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছেপে ব ার হওয়া। দ্বিতীয় ঘটনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে যে মিশন প্রেস কেবলমাত্র খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক উপদেশ সম্বলিত বা নীতিকথা জাতীয় গ্রন্থবলী প্রকাশেই উৎসাহী ছিল না; বরং সাধারণ মানুষের জ্ঞানপিপাসা, মেটানোর জন্য, শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং ছাত্রদের কল্যাণার্থেও বহু বই প্রকাশ করেছে। বস্তুতঃ, প্রতিষ্ঠিত হওযার মাত্র বছর পাঁচেকের মধ্যেই এই ছাপাখানার কর্মযজ্ঞ এখন বহুধাবিস্তৃত হয়েছিল যে বাংলা ছাড়া অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায়, এমন কি চীনা, ব ার্মিজ ইত্যাদি প্রাচ্য ভাষাতেও ছাপার কাজ চলছিল। ভারতীয় ও বাঙালী লেখকদের পাশাপাশি সমানতালে কলম ধরেছিলেন জন মার্শম্যান, ফেলিক্স কেরীরাও।
মুদ্রণ ও জনশিক্ষা - এই দু'টির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। একটি না থাকলে অন্যটির বিকাশ সম্ভব নয়। ঠিক এই কারণেই ফো র্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানাও ঐকান্তিক সম্পর্কে জড়িত আর তার ফলে বাংলা ও বাঙালীর শিক্ষাব্যবস্থার একটা নতুন যুগলক্ষণ সূচিত হয়েছিল। এতদিন টোল, পাটশালা ইত্যাদিতে, সম্ভবত ঃ পাঠ্যবই - এর দুর্লভতার কারণেই স্মৃতিনির্ভরতা, শ্রুতিনির্ভরতা এবং লেখার ওপর নির্ভরতা অনেক বেশি ছিল। নতুন ইংরেজী ধারার শিক্ষাব্যস্থায় লেখা এবং পড়া উভয়ের ওপরই সমান জোর দেওযা হল। ফলে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাগত এবং উৎকর্ষগত উন্নতি যাতে হয় -- তার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হল। অর্থাৎ শুধু বেশি সংখ্যার নয়, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যে এবং ভ াষা ও প্রকাশভঙ্গির সরসতায় সত্যিকার ভালো বই যাতে রচিত ও প্রকাশিত হতে পারে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হল।
১৮১৭ সালটি বাঙালীর শিক্ষার ইতিহাসে খুবই গুত্বপূর্ণ। এই বছরেই স্থাপিত হল 'হিন্দু কলেজ' আর 'স্কুল বুক সোস াইটি'। ঠিক এক বছর পরই কলকাতা স্কুল সোসাইটির আবির্ভাব ঘটল। স্কুল বুক সোসাইটি আর স্কুল সোসাইটির উদ্দেশ্য কী ছিল তা নীচের সারণীতে দেখানো হল ঃ-

স্কুল বুক সোসাইটি

গ্রন্থকারদের দিয়ে পাঠ্যবই ছাপানো বিনামূল্যে স্কুল ছাত্রদের
পাঠ্যবই রচনা করানো মধ্যে এইসব লেখানো ও
ছাপানো পাঠ্যবই বিতরণ

কলকাতা স্কুল সোসাইটি

শহরের আদি, শনাতন নতুন স্কুল ও দরিদ্র ও মেধাবী

পাঠশালাগুলির পরিদর্শন পাঠশালা স্থাপন ছাত্রদের উচচতর
ও উন্নতিসাধন শিক্ষার ব্যবস্থা করা

প্রচুর ভাল বই বিভিন্ন বিষয়ে এবং নামমাত্র মূল্যে ছেপেছেন স্কুল বুক সোসাইটি। কাজ শু করার সাত - আট বছরের মধ্যে কলকাতা ও মফঃস্বলের বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের কাছে লক্ষাধিক বই পৌঁছে দিয়েছেন এঁরা। তৎকালীন পাঠ্যপুস্তকের ব াজারে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল স্কুল বুক সোসাইটির। ইংরেজি - বাংলা বিদ্যালয়গুলিতে তো বটেই, এমন কি সনাতনী বাংলা পাঠশালাগুলিতেও ছিল এঁদের বই - এর চাহিদা। আর মূল কারণ, বিষয়বস্তুর উঁচুমান এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনের পরিপাট্য। নগদ মূল্যের এঁরা ভাল বই -এর গ্রন্থস্বত্ব কিনেও নিতেন আর তাতে লেখকদের মধ্যে উচচমানের পাঠ্যবই রচন ার উৎসাহও অনেক বেড়েছিল। ১৮৩৪ - ৩৫ সালে সোসাইটির নতুন বই প্রকাশের কাজ নানা কারণে সাময়িক বন্ধ ছিল, পরিবর্তে জোর দেওয়া হচ্ছিল পুরোনো বই - এর পুনঃপ্রকাশে। ফলে একসময় পাঠ্যবই - এর জমজমাট বাজারটি গেল হাতছাড়া হয়ে। সেই শূন্যস্থান পুরণে এগিয়ে এল অন্যান্য প্রকাশন সংস্থা। এদের মধ্যে সংস্কৃত প্রেস, বিজলী প্রেস, ভ ার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তটি অবশ্য মূলতঃ বিদেশী কাহিনীর অনুবাদ প্রকাশের ক াজেই রত ছিল।

১৮১৪ সালে রাজা রামনোহন রায় কলকাতায় বসবাস শু করেন। মহামতি ডেভিড হেয়ারের সগে তাঁর অন্তরঙ্গতা গড়েউঠতে দেরী হয়নি। তাঁরা দু'জনে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প নিয়ে তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচ ারপতি স্যার হাইড ইষ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্যার হাইড ইষ্টের উদ্যোগে একটি সমিতি গঠিত হল -- যা থেকে অবশ্য রামমোহন রায়কে সরে আসতে হয়। কিন্তু এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল। সা হিত্য সাধনা বা পাঠ্যবই রচনা রামমোহনের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকের কাজই করে গেছেন সারা জীবন ধরে। তবুও বাংলা গদ্যকে এক সাবলীল, স্বাধীন, সংহত রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁকেই দিতে হবে। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা ভাষা শিক্ষার সোপান তৈরী করেছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে হেদুযার কাছে একটি ইংরেজী স্কুলও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে ১৮২২ সালে এরই নিকটবর্তী এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল'।

১৮২০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মান। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জল জ্যোতিষ্ক তিনি। সা হিত্য রচনার উপযোগী বাংলা ভাষার সৃষ্টি তাঁরই হাতে বা বলা যায় আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির জনক তিনি। ছোটদের শিক্ষার জন্য রচনা করেছেন শুধু 'বর্ণপরিচয়' নয়, 'কথামালা', 'চরিতাবলী' 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি অমূল্য বই, যেগুলিকে কেবলমাত্র পাঠ্যবই -এর গন্ডীতে সীমায়িত করা যায় না; গল্প বলার সহজ ভঙ্গিতে, ভাষার সরসত ায় যা সুসাহিত্যের স্তরে উন্নীত। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল চিত্তের বিকাশ ঘটানো। আর বিকচমান চিত্ত তার সব খোর াক খুঁজে পায় না পাঠ্য বই - এর পাতায়। তাই শিক্ষার পাশাপাশি ছোটদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজন। এটা বুঝেছিলেন অনেকেই। তাই পাঠ্যবই - এর পাশাপাশি ধারায় বহমান হচ্ছিল শিশুসাহিত্যের স্রোতটিও। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বাঙালীম াত্রই এঁদের অবদান সম্পর্কে অবগত আছেন। বাংলা শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধি ও সরসতায় পরিপূর্ণ ও আরো বর্ণময়হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের লেখনীতে। এর পরের ইতিহাস একেবারে সাম্প্রতিক; তা আর বোধহয় বিস্তারিত বল ার অপেক্ষা রাখে না।

শিক্ষার প্রধান উপাদান বই, বিশেষতঃ পাঠ্যবই বাংলাদেশে কীভাবে তার শৈশব ও কৈশোর উত্তীর্ণ হল তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করে এবার একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। এবার দেখা যাক গ্রন্থের আগার (গ্রন্থাগার) কীভাবে শিক্ষাবিস্ত ারে প্রত্যক্ষ ওপরোক্ষ সহায়তা করে, আর এই বাংলা দেশে কীভাবে তার সূচনা হল।

শিক্ষার দুটি ধারাঃ (১) প্রথাগত শিক্ষা যা বিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অর্জিত হয়, আর (২) স্বশিক্ষা, যা ধারাবাহিক, জীবনব্যাপী এবং যেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিরাট। রাষ্টসংঘে শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি বিষয়ক শাখা বা প্রতিষ্ঠান (UNESCO) সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ইস্তাহারে সাধারণ গ্রন্থাগারের অভীষ্ট লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তার

রূপরেখা নির্ধারণ করেছে। তাতে লক্ষ্যসমূহ সম্বন্ধে বলা আছে ঃ

১। আজীবনকাল ধরে ত্রিজনীন শিক্ষার সহায়তা করা;

২। মানুষের লব্ধ জ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুধাবন ও অনুসরণে সকলকে সমর্থ করে তোলা;

৩। লিপিবদ্ধ ভাবনা ও সৃজনশীল কল্পনাশক্তির সম্পদ সকলের মধ্যে বিনামূল্যে / নিখরচায় পরিবেশনের প্রধান মাধ্যম হিসাবে কাজ করা;

৪। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা;

৫। অবসর ও চিত্ত বিনোদনার্থে বই সরবরাহ করে মানসিক উৎকর্ষসাধন;

৬। ছাত্রছাত্রীদের (পাঠ) সহায়তা করা; ইত্যাদি

এগুলি থেকে একটি ধারণা স্পষ্ট গড়ে ওঠে যে শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরেই গ্রন্থাগারের স্থান। শিক্ষাকে জনমুখী করে তুলতে তার ভূমিকা অসামান্য। পাঠক্রমের মাধ্যমে যে শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি তার বাইরেও থাকে যে বিশাল জ্ঞানভান্ডার তার চাবিকাঠি গ্রন্থাগারিকের হাত। শুধু তাই নয়, শিক্ষার এক প্রধান অংশ হল সামাজিক শিক্ষা বা Social education যার প্রসারে এক প্রধান সহায়ক শক্তি গ্রন্থাগার, বিশেষতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার।

আমাদের বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রথম আবির্ভাব কোথায়, কীভাবে হল আমাদের সেই অতীতের দিকে ফিরে তাকানো দরকার। যতদূর জানা যায় ১৭৭০ সালে পুরোনো কেল্লায় জনৈক জোন্‌স সাহেবের পরিচালনায় একটি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। হিকির গেজেটে উল্লেখ আছে ঐ কেল্লাতেই জন এন্ড্রুজ -এর সার্কুলেটিং লাইব্রেরির। পরে 'ক্যালকাটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরি' নামে একটি বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় যেটি ১৭৯২ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে প্রতিষ্ঠিত হল এশিয়াটিক সোসাইটি ওতার গ্রন্থাগার। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে সংযোজিত হল এক নবতম অধ্যায়।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রন্থাগারগুলিও গড়ে উঠতে থাকল। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেই একে একে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), শ্রীরামপুর কলেজ ১৮১৮), ওরিয়েন্টাল সেমিনারি (১৮২৩), জেনারেল অ্যাসেম্বলি (১৮৩০), সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (১৮৩৫), হুগলী মহসিন কলেজ (১৮৩৬) আর দাহের সংশ্লিষ্ট গ্রন্ধাকারগুলি গড়ে উঠল। এছাড়া কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৬, শিবপুর বি ই কলেজ গ্রন্থাগার (১৮৫৬) ইত্যাদি বিশেষ বিদ্যায়তনের গ্রন্থাগারগুলিও গড়ে উঠেছিল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি পাশাপশি ঊনিশ শতকে ব্যাপক হারে গড়ে উঠেছিল চাঁদা - ভিত্তিক বা দানপুষ্ট গ্রন্থাগারগুলি, যাদের দরজা ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠার পিছনে কাজ করছিল এক নবজাগ্রত সমাজ চেতনা ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। এই সময়কার সবচেয়ে সুসংগঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার। এটি স্থাপনের পিছনেকলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের এবং ইংরেজ বিদ্যানুরাগী মানুষদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালেএইগ্রন্থাগারের সংগ্রহ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যুক্ত হয় আর স্বাধীনতা - উত্তর কালে এই ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরিই জাতীয় গ্রন্ধাগার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শুধু শহর কলকাতায় নয় -- সংলগ্ন, এমন কি দূরবর্তী জেলাগুলিতেও গড়ে উঠল বহু সাধারণ সংগ্রহের কৌলিন্যে, পরিষেবার ঔদার্যে যেগুলিআমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গৌরবময় সংযোজন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম না উল্লেখ করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এগুলি হলঃ রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার (১৮৫১), হুগলী পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৪), কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৬), কোন্নগর লাইব্রেরি ১৮৫৮), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৯), বান্ধব লাইব্রেরি (জয়নগর - মজিলপুর, ১৮৬৯), শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১), বারাসাত অ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরি(১৮৭১), ইউনাইটেড রিডিং ম (কলকাতা, ১৮৭২), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩), শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭৪), শশীপদ ইনস্টিটিউট (কলকাতা, ১৮৭৬), বরানগর পিপ্‌লস লাইব্রেরি (১৮৭৬), ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান লাইব্রেরি (১৮৭৬) মুদিয়ালি পাবলিক লাইব্রেরি (কলকাতা, ১৮৭৬), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি (১৮৭৯), তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮২), বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি (১৮৮৩), ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি (হাওড়া, ১৮৮৪), বালি সাধারণ গ্রন্থাগার (১৮৮৫), সুবার্বণ রিডিং ক্লাব (কলকাতা, ১৮৮৮), চৈতন্য লাইব্রেরি (কলকাতা,১৮৮৯), ভারতী পরিষদ লাইব্রেরি (কলকাতা, ১৮৯০), বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি

(১৮৯১), ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি, (১৮৯১), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি (১৮৯৩) ইত্যাদি। তালিকা কিঞ্চিৎ দীর্ঘই হল। কিন্তু বাংলার ও বাঙালীর মননচর্চায় এদের ভূমিকা এতই গুত্বপূর্ণ যে এদের উল্লেখ না করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায় না।

যাইহোক্ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির স্থাপন ও বিকাশ দুইই সেই সময়কার সমাজমনস্ক মানুষের প্রয়াসের ফল। সামাজিক শিক্ষা প্রসারে এতগুলি প্রত্যক্ষ কোন কর্মসূচি না নিলেও পরোক্ষে এরা বহুভাবে জনমানসে শিক্ষার বীজ বপন করতে সাহায্য করেছে। এই আলোচনা শু হয় বাংলাদেশে ইংরেজী ধারার শিক্ষা বিস্তারের সূচনালগ্ন থেকে --- যাতে স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল পাঠ্যবই রচনা, প্রকাশনা ও বিতরণের প্রসঙ্গ। আর শিক্ষা বিস্তারের সূত্র ধরে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উপকরণ বই - এর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তিস্থান হিসেবে গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গও এসেছে। ঊনবিংশ শতকের সাধারণ গ্রন্থাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের কথা আমরা আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখের প্রয়োজন আছে ঐ সময় সব কটি স্কুলে না হলেও মেট্রোপলিটান স্কুল প্রভৃতি কয়েকটি বিদ্যালয়েও ভাল লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছিল। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে অবশ্য শিশুবিভাগ ছিল না তবে পরবর্তীকালে কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগারে কিশোর পাঠকদের উপযোগী বইপত্রের সম্ভার গড়ে তোলা হয়েছিল। জ্ঞানের রাজ্য উন্মুক্ত হয়েছিল খুলে গিয়েছিল বন্ধ বাতায়ন। এই প্রসঙ্গে জয়গোস্বামীর বাল্য অভিজ্ঞতার কটি কথা বলে শেষ করতে চাই।

“আমার ছোটবেলার লাইব্রেরী ছিল আমার মায়ের স্কুলের লাইব্রেরী। মাত্র এক আলমারী বই ছিল তাতে। কিন্তু তাই ছিল আমার মতো বালকের পক্ষে অনেক।...

মনে পড়ে বড় আলমারীর পর ছোট আলমারী তারপর আবার বড় আলমারী দিয়ে তৈরী ছোটো গলি। যেন শেষ পাওয়া যাবে না। আবছা হয়ে ভেসে আসে দূরে পৃথিবীর কথোপকথন। হঠাৎ, আলমারী দিয়ে তৈরী কোনো গলি শেষ করেই পেয়ে যাওয়া আশর্চ্য একটি জানলা, যার নীচে এইমাত্র জন্ম নেওয়া একটি পুকুর আর হাইড্রেন। আর জলের শব্দ। যার ওপরে চাঁদ । যার ওপারে জ্যোৎস্নার মায়াবী জগৎ...

গ্রন্ধাগার, আজো, আমার কাছে একটি জানলা।”

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com